

যাযাবর পাখিদের সন্ধানে

ভূ-পর্যটক বললে হয়তো চট করে বিখ্যাত কজন পরিব্রাজকের কথাই আমাদের মাথায় আসে। কিন্তু মানুষ ছাড়াও অন্য প্রাণীদের মধ্যেও কি পর্যটক দেখা যায়? পরিযায়ী পাখিদের কথা নিশ্চয়ই তোমরা সকলেই জানো, যারা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে অন্য দেশে গিয়ে ঘর বাঁধে। এই শিখন অভিজ্ঞতায় এই যাযাবর প্রাণীদের সম্পর্কে আরেকটু জেনে নেয়া যাক, চলো!





প্রথম ও দ্বিতীয় সেশন

- ✎ তোমাদের এলাকায় এমন কোনো পাখি কি দেখেছ যাদের শুধু বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়েই দেখা যায়? কখনও ভেবে দেখেছ বছরের বাকি সময়টা এরা কোথায় থাকে?
- ✎ অনেকে নিশ্চয়ই ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছ এখানে কাদের কথা বলা হচ্ছে! হ্যাঁ, পরিযায়ী পাখিদের (যাদের অনেক সময়ে অতিথি পাখিও বলা হয়) কথাই বলছি। তোমাদের এলাকায় কোন কোন পরিযায়ী পাখি এসে বাসা বাঁধে, বছরের কোন সময়ে এদের দেখা যায় তোমরা কি বলতে পারো? তোমার সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নিচে লিখে রাখো-

এলাকার নাম (গ্রাম/থানা/উপজেলা, জেলা) :

পরিযায়ী পাখির নাম	বছরের কোন সময়ে দেখা যায়?
<p>নর্দান পিনটেইল, খয়রা চখাচখি, কার্লিউ, বুনো হাঁস, ছোট সারস, বড় সারস, হেরন, নিশাচর হেরন, ডুবুরি পাখি, কাদাখোঁচা, গায়ক রেন, রাজসরালি, পাতিকুট, গ্যাডওয়াল, পিনটেইল, নরদাম সুবেলার, কমন পোচার্ড, বালি হাঁস, লেঞ্জা, চিতি, সরালি, পাতিহাঁস, বুটিহাঁস, বৈকাল, নীলশীর পিয়াং, চীনা, পান্ডামুখি, রাজামুড়ি, কালোহাঁস, রাজহাঁস, পেড়িভুতি, গিরিয়া, খঞ্জনা, পাতারি, জলপিপি, পানি মুরগি, নর্থ গিরিয়া, পাতিবাটান, কমনচিল, কটনচিল প্রভৃতি।</p>	<p>ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি পাখি আসে বাংলাদেশে।</p>

- ✎ এবার পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া পাখিগুলোর ছবি দেখো, এদের মধ্যে কোনো পাখি কি চিনতে পারো? তোমাদের এলাকায় কখনও দেখেছ? বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করে দেখো তারা কেউ চিনতে পারে কি না।



খয়রা চখাচখি



কালো স্কিমার



দেশী শুমচা



বন বাটান



লালঝুঁটি ভুতিহাঁস



সাদা খঞ্জর

- ✎ এবার ক্লাসের সবাই আলোচনা করে দেখো, কেউ কোনো পাখি চিনতে পারল কি না।
- ✎ পরিযায়ী পাখি সামনাসামনি দেখার সৌভাগ্য না হলেও নিশ্চয়ই পত্রপত্রিকায় পড়েছ? বছরের কোন সময়ে এরা আসে? কোথা থেকেই-বা আসে? চলো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে দেখা যাক।
- ✎ প্রথমে শিক্ষকের নির্দেশ মোতাবেক দলে ভাগ হয়ে যাও। পৃথিবীর কোন অঞ্চল থেকে পরিযায়ী পাখিরা এদেশে আসে, কিংবা তাদের যাত্রাপথ আসলে কেমন সেটা বোঝার জন্য আগে পৃথিবী-পৃষ্ঠে বিভিন্ন জায়গার অবস্থান কীভাবে নির্দিষ্ট করা হয় তা জানতে হবে। সেজন্য শুরুতে পৃথিবীর একটা মডেল বানানো দরকার।
- ✎ তোমাদের স্কুলে গ্লোব আছে নিশ্চয়ই? প্রথম কাজ হলো সেটা দেখে নিজেরা পৃথিবীর একটা মডেল তৈরি করা। যে কোনো বল বা গোলক আকৃতির কিছু গায়ে সাদা কাগজ মুড়ে মডেল তৈরির কাজটা শুরু করতে পারো।
- ✎ এখন এই গ্লোবে বিভিন্ন এলাকা চিহ্নিত করার পালা। কিন্তু কাজটা কীভাবে করা যায়, বলো তো? পৃথিবীর মডেলে মহাদেশগুলো এমনভাবে আঁকা দরকার যেন অতিথি পাখির যাত্রাপথের একটা ধারণা ভালোভাবে পাওয়া যায়। সেজন্য পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোনো জায়গার অবস্থান কীভাবে বোঝানো যায় সেটা জানা জরুরি।
- ✎ শিক্ষকের দেয়া গ্লোবটা ভালোভাবে লক্ষ করো। গ্লোবের উপর থেকে নিচে লম্বালম্বি এবং দু পাশে আড়াআড়ি বেশ কিছু রেখা টানা হয়েছে খেয়াল করেছ? এই রেখাগুলো কী কাজে লাগে বলতে পারো? তোমার ধারণা নিচে লিখে রাখো।

অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমাংশ সাহায্যে পৃথিবীর কোনো স্থানের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। এই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ব্যবহার করে কোনো স্থান যেমন সুনির্দিষ্ট ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, তেমনি আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানা সম্ভব হয়।

- ✎ অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের “ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক, স্থানিক সময় এবং অঞ্চলসমূহ” অধ্যায়ের ভৌগোলিক স্থানাঙ্কের অংশটুকু পড়ে দলে আলোচনা করো।
- ✎ এবার অক্ষাংশ কীভাবে বের করা হয় সেই অংশটুকু একই অধ্যায় থেকে পড়ে নাও। অক্ষাংশের মাপ নেবার জন্য তোমাদের বানানো মডেলটা কেটে বোঝার চেষ্টা করলে সেটা আর ব্যবহারযোগ্য থাকবে না। কাজেই কোনো নিরেট গোলকাকৃতির বস্তু নিয়ে এই পর্যবেক্ষণটি করতে পারো, যেমন

পেয়ারা বা কমলা ব্যবহার করা যেতে পারে। পেয়ারার গায়ে দাগ কেটে এটাকে উপর থেকে নিচে মাঝ বরাবর কেটে নিয়ে অক্ষাংশের কোণ মেপে দেখতে পারো। (কাটাকাটির জন্য ছুরি বা ধারালো কিছু ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধান থেকো যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে)।

- ✎ পেয়ারার (বা অন্য যে কোনো নিরেট গোলক যেটা পর্যবেক্ষণে ব্যবহার করছ) গায়ে অক্ষাংশ মেপে বিষুবরেখা, কর্কটক্রান্তি রেখা, মকরক্রান্তি রেখা, মেরু রেখা ইত্যাদি ঐকে নাও। তোমাদের বানানো পৃথিবীর মডেলে একইভাবে এই রেখাগুলো আঁকার চেষ্টা করো।



তৃতীয় সেশন

- ✎ এই সেশনের শুরুতে আগের দিনের মডেলগুলো দেখে আগের আলাপগুলো একবার ঝালাই করে নাও।

- ✎ এবার অক্ষাংশের তাৎপর্য ও ব্যবহার, অক্ষাংশের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে পড়ে নাও। বইয়ে দেয়া প্রশ্ন তিনটির উত্তর কী হতে পারে তা নিয়ে দলে সিদ্ধান্ত নাও। শিক্ষকসহ ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে তোমাদের উত্তরগুলো আলোচনা করো।



- ✎ এবার তোমাদের বানানো মডেলে বিষুবীয় অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, মেরু অঞ্চল চিহ্নিত করো।

- ✎ একইভাবে দ্রাঘিমাংশ বের করার পদ্ধতি পড়ে নিয়ে নিজেরা আগের মতো কোণ মেপে হিসাব করার চেষ্টা করো।

- ✎ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থান কীভাবে বের করা হয় তা কি বুঝতে পারছ? এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে। আরও সূক্ষ্মভাবে মেপে দেখলে তোমার স্কুলের অবস্থানটাও একেবারে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব। এমনকি এই মুহূর্তে তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তাও পৃথিবীর মানচিত্রে অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের সূক্ষ্ম হিসেব দিয়ে বলা সম্ভব। তোমাদের শিক্ষকের স্মার্টফোন ডিভাইস থেকে থাকলে তাকে

GPS কী?

GPS এর পুরো নাম Global Positioning System (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম)। একসময় মানচিত্র, কম্পাস, স্কেল ইত্যাদি দিয়ে মেপে ও অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা হত। এখন GPS প্রযুক্তি ব্যবহার করে খুব সহজে ও নিখুঁতভাবে পৃথিবীর যেকোন স্থানের অবস্থান জানা যায়। গাড়ি, জাহাজ, প্লেন, ল্যাপটপ এমনকি সাধারণ মডেলের স্মার্টফোনেও এখন GPS রিসিভার থাকে।




জিঙ্গেস করে তোমাদের স্কুলের অবস্থানটা নির্দিষ্ট করে জেনে নাও। স্মার্টফোনের জিপিএস ব্যবহার করে যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ বের করা যায়।

✎ মানচিত্রের সাহায্য নিয়ে নিচের ছকে দেয়া দেশগুলোর অবস্থান অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ দিয়ে চিহ্নিত করতে পারবে? দলের অন্যদের সাহায্য নাও।

দেশের নাম	মানচিত্রে অবস্থান (অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ)
কম্বোডিয়া	১১°৩৩' উত্তর ১০৪°৫৫' পূর্ব
উরুগুয়ে	৩৪°৫৩' দক্ষিণ ৫৬°১০' পশ্চিম
ডেনমার্ক	৫৫°৪৩' উত্তর ১২°৩৪' পূর্ব
মাদাগাস্কার	১৮°৫৫' দক্ষিণ ৪৭°৩১' পূর্ব
জাপান	৩৫°৪১' উত্তর ১৩৯°৪৬' পূর্ব
সেনেগাল	১৪°৪০' উত্তর ১৭°১৫' পশ্চিম

✎ এবার একটা ছোট্ট খেলা খেলা যাক। ক্লাসের ভেতরে এক দল অন্য দলকে কোনো একটি দেশের



অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ জিজ্ঞেস করবে, অন্য দলের কাজ হবে সেটা পৃথিবীর মানচিত্র দেখে বলা।

- ✎ একটা বিষয় খেয়াল করেছ? গ্লোবে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যে আকার দেখি, ছাপানো দ্বিমাত্রিক মানচিত্রে যে আকার দেখি তা ছবছ এক নয়। গোলাকার একটা তলকে যখন দ্বিমাত্রিক তলে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় তখন এই বিপত্তি ঘটে। বিশ্বাস না হলে তোমরা গ্লোবে এন্টার্কটিকা মহাদেশের আকার, আর ছাপানো মানচিত্রে বা যেকোনো দ্বিমাত্রিক মানচিত্রে একই মহাদেশের আকার তুলনা করে দেখো!

চতুর্থ সেশন

- ✎ এই সেশনের শুরুতে তোমাদের তৈরি পৃথিবীর মডেলে অক্ষরেখা আর দ্রাঘিমা রেখার মিলিয়ে নিয়ে গ্লোব বা মানচিত্রের সাহায্যে মহাদেশগুলো ঐকে নাও।
- ✎ এবার একটা বিষয় ভেবে দেখো। বাংলাদেশে যখন ভরদুপুর, পৃথিবীর উল্টোদিকে তো তখন মধ্যরাত। তাহলে কোন দিকে কখন দিন, শুরু হবে, কটা বাজবে সেটা কীভাবে ঠিক হবে? আবার একেক জায়গায় যেহেতু একেক সময়ে দিন শুরু হচ্ছে, তাহলে কোন এলাকায় কোন তারিখ তা কীভাবে ঠিক করা যাবে?
- ✎ এই সমস্যার সমাধানের জন্য সকল দেশ একটা নির্দিষ্ট নিয়মে এই দিন-তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে একমত হয়েছে। তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা, এবং সময় ও তারিখ নির্ণয়ের উপায় অংশটুকু পড়ে নাও। নিজেরা আলোচনা করো, কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হলে বাকিদের সাহায্য নাও।
- ✎ ঘড়িতে কটা বাজে একবার দেখে নাও। এবার আগের সেশনে আলোচিত দেশগুলোর অবস্থান আরেকবার দেখে নিয়ে হিসেব করে বের করো, এখন এই দেশগুলোর কোথায় কটা বাজে?

দেশের নাম	এই মুহূর্তে ঘড়িতে সময়
বাংলাদেশ	<u>সকাল ১১.০০টা</u>
কম্বোডিয়া	দুপুর ১২.০০টা
উরুগুয়ে	রাত ২.০০টা
ডেনমার্ক	সকাল ৬.০০টা
মাদাগাস্কার	সকাল ৮.০০টা
জাপান	দুপুর ২.০০টা
সেনেগাল	সকাল ৫.০০টা



পঞ্চম সেশন

পৃথিবীর মানচিত্র নিয়ে ভাবতে ভাবতে পরিযায়ী পাখিদের কথা ভুলে যাওনি তো? পরিযায়ী পাখিদের ভ্রমণের পথ সম্পর্কে জানার কয়েকটি উপায় আছে। তারমধ্যে খুবই কার্যকর একটা উপায় হলো এই পাখিদের গায়ে একটা ছোট ডিভাইস সংযুক্ত করে দেয়া যার মাধ্যমে পাখিটি কখন কোথায় আছে তা জানা যায়। আর এই পাখিদের যাত্রা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা চমকপ্রদ সব তথ্য পেয়েছেন।

পরের পৃষ্ঠায় দেখানো পৃথিবীর মানচিত্রে পরিযায়ী পাখিদের প্রধান যাত্রাপথগুলো দেখানো হয়েছে লক্ষ্য করো। এই মানচিত্রে বাংলাদেশের উপর দিয়ে, বা কাছ দিয়ে কোন পথগুলো গেছে খেয়াল করেছ? নামগুলো নিচে লিখে রাখো—

বাংলাদেশের উপর দিয়ে যাওয়া পথের নাম Asian-Australasian Flyway

আর বাংলাদেশ কাছ দিয়ে পথগুলো হচ্ছে West Asian-East African

Flyway এবং Central Asian Flyway

মানচিত্রে যে কয়েকটি ভ্রমণপথ বা ফ্লাইওয়ে বাংলাদেশের উপর দিয়ে গেছে পৃথিবীর মানচিত্র বা গ্লোব, কিংবা তোমাদের তৈরি পৃথিবীর মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। এক-একটা ফ্লাইওয়ে ধরে কী বিশাল লম্বা পথ এই পাখিরা পাড়ি দেয় ভেবে দেখেছ?

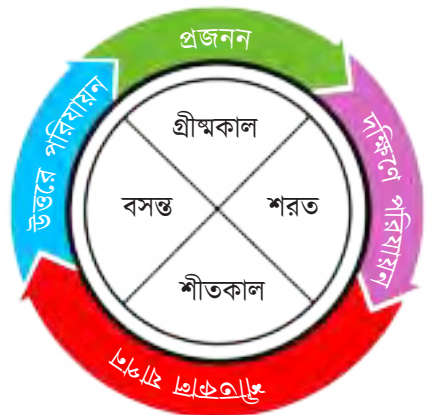
শুধু East Asian-Australian Flyway দিয়েই এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে ২৫০ প্রজাতির প্রায়



৫ কোটি পাখি চলাচল করে থাকে। এই ফ্লাইওয়ে বাংলাদেশসহ আর কোন কোন দেশের উপর দিয়ে গেছে নিচে লিখে রাখো—

East Asian-Australian Flyway পথটি বাংলাদেশ, রাশিয়া, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপিন্স, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, পাপুয়া নিউগিনি, নিউজিল্যান্ড এর উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে।

সারা পৃথিবীতে অজস্র পাখি পরিযায়ন করে, তবে তাদের এই পরিযায়নের একটা সাধারণ প্যাটার্ন আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই পরিযায়ী পাখিরা শরত/হেমন্তের দিকে দক্ষিণের দিকে পরিযায়ন শুরু করে। শীতকালটা তারা প্রায়শই দক্ষিণের কোনো অঞ্চলে কাটায়। বসন্তে তারা আবার উত্তরের দিকে যাত্রা শুরু করে, গ্রীষ্মে উত্তরের অঞ্চলগুলোতেই তারা বাসা বাঁধে ও প্রজনন করে। তবে বাংলাদেশে যেসব পরিযায়ী পাখি আমরা দেখি তারা অনেকেই শুধু শীতকালেই আসে এমন নয়। অনেক পাখি শীতের বেশ কয়েক মাস আগে এসে শীতের



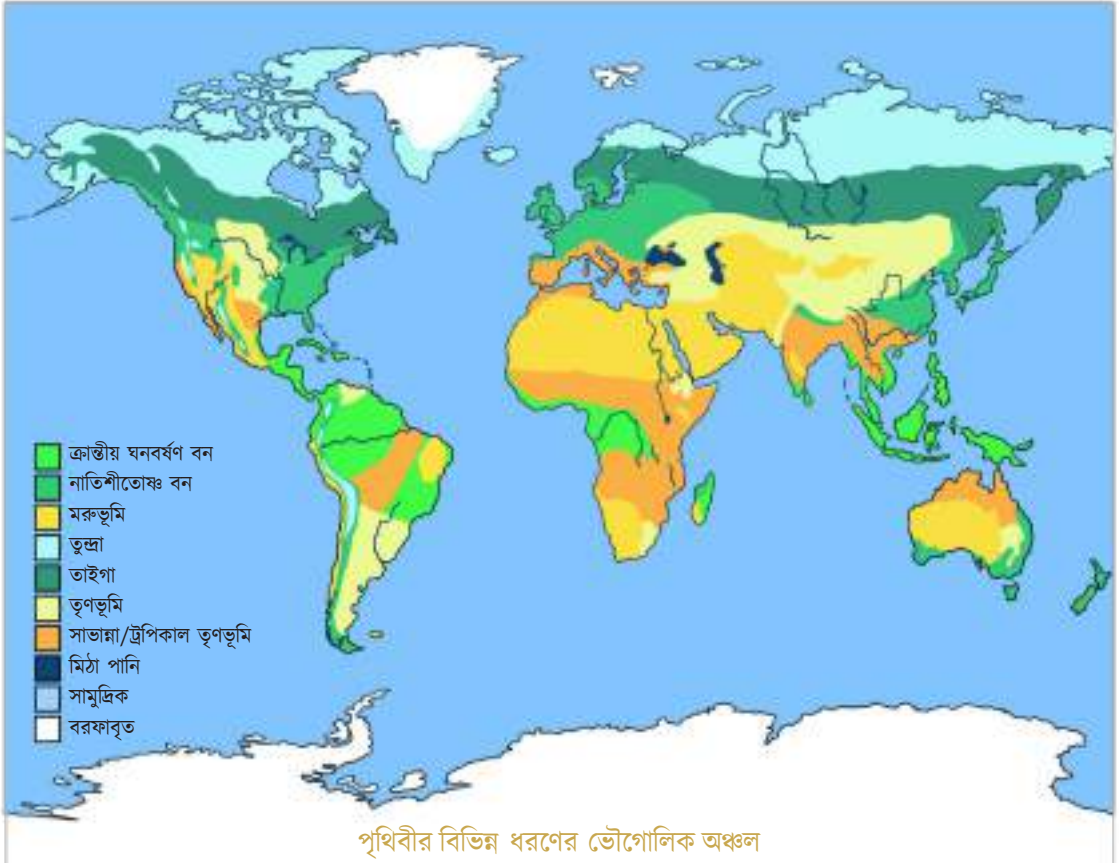
সময়ে আরও দক্ষিণে চলে যায়।

- ✎ পাখিদের এই পরিযায়নের কারণ কী? সত্যি বলতে তা এখনো নিশ্চিত করে জানা যায়নি, তবে ধারণা করা হয় খাদ্যের প্রাচুর্যের খোঁজে, কিংবা তীব্র শীত থেকে বাঁচতে পাখিরা এই পরিযায়ন করে। পৃথিবীর কোন এলাকার ভূমিরূপ বা জলবায়ু কেমন তা জানলে এই বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।
- ✎ পরের পৃষ্ঠায় মানচিত্রটি দেখো, এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল চিহ্নিত করা আছে। প্রধান প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য তোমাদের অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ে দেয়া আছে, সেখান থেকে পড়ে নাও। পরের সেশনে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।



ষষ্ঠ সেশন

- ✎ আগের সেশনের মানচিত্রের সঙ্গে পরিযায়ী পাখিদের ভ্রমণপথের চিত্র মিলিয়ে দেখো, এই পাখিরা কোন ধরনের অঞ্চল থেকে কোন ধরনের অঞ্চলে পরিযায়ন করে, বছরের কোন সময়ে এরা কোন ধরনের অঞ্চলে থাকে। বন্ধুদের সঙ্গে বসে আলোচনা করে মিলিয়ে দেখো।
- ✎ এখন প্রশ্ন হলো, বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূমিরূপ ও আবহাওয়ার এই পার্থক্যের কারণ কী? দিন-রাত বা ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর একটা সম্পর্ক আছে বুঝতেই পারছ।
- ✎ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তোমরা সূর্য ও তাকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের একটা মডেল বানিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পারো, কোন এলাকায় সূর্যের আলো কীভাবে পড়ে। শুরুতে তোমাদের আগেই তৈরি করে রাখা পৃথিবীর মডেলে প্রধান কয়েকটি ভৌগোলিক এলাকা বিভিন্ন রং দিয়ে চিহ্নিত করে নাও, এই এলাকাগুলোর কোনটার অক্ষাংশ কত তাও অনুমান করার চেষ্টা করো। এবার সূর্যের মডেল হিসেবে যে কোনো একটি আলোর উৎস ঠিক করে নাও (মোমবাতি বা এলইডিও ব্যবহার করতে পারো) এবং তার চারপাশে তোমাদের পৃথিবীর মডেলটাকে ঘুরিয়ে দেখো ঘূর্ণন পথের কোন অবস্থানে থাকাকালে পৃথিবীর কোন অঞ্চলে সূর্যের আলো কীভাবে পড়ছে। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণনের পথ এবং এই ঘূর্ণনের ধরন বোঝার জন্য অনুসন্ধানী পাঠ বইয়ের “সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ” অধ্যায়ে সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর ঘূর্ণন অংশের সাহায্য নাও। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পরের ছকটি পূরণ করো—



বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল	বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো আপতিত হবার দিক (খাড়াভাবে/তির্যকভাবে)				দিনের দৈর্ঘ্য (শুধুই দিন/দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে বেশি/রাতের দৈর্ঘ্য দিনের চেয়ে বেশি/দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি/শুধুই রাত)			
	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর
উত্তর মেরু	খাড়াভাবে	খাড়াভাবে	তির্যকভাবে	তির্যকভাবে	দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	শুধুই দিন	দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	শুধুই রাত
তুন্ড্রা অঞ্চল		খাড়াভাবে	তির্যকভাবে		দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে বেশি	দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	রাতের দৈর্ঘ্য দিনের চেয়ে বেশি

বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল	বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের আলো আপতিত হবার দিক (খাড়াভাবে/তির্যকভাবে)				দিনের দৈর্ঘ্য (শুধুই দিন/দিনের দৈর্ঘ্য রাতের চেয়ে বেশি/রাতের দৈর্ঘ্য দিনের চেয়ে বেশি/দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি/শুধুই রাত)			
	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর	২১শে মার্চ	২১শে জুন	২৩শে সেপ্টেম্বর	২২শে ডিসেম্বর
মরুভূমি	খাড়াভাবে	খাড়াভাবে			দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি		দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	
চিরহরিৎ বন	খাড়াভাবে			তির্যকভাবে	দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি		দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	
দক্ষিণ মেরু	তির্যক- ভাবে	তির্যক- ভাবে	খাড়াভাবে	খাড়াভাবে	দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	শুধুই রাত	দিন ও রাতের দৈর্ঘ্য কাছাকাছি	শুধুই দিন

- ✎ ছকের তথ্যগুলো নিয়ে তোমাদের দলে আলোচনা করো। সূর্যালোকের বিকিরণের প্যাটার্নের সঙ্গে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল সৃষ্টির কোনো সম্পর্ক কি খুঁজে পাও?
- ✎ আলোচনার পর দলীয় সিদ্ধান্ত ক্লাসের বাকিদের সামনে উপস্থাপন করো। বাকিদের মতামত শোনো।
- ✎ এবার সবার আলোচনার ভিত্তিতে নিচের প্রশ্নের উত্তর লেখো,
 - ☑ পৃথিবীর ক্রমাগত ঘূর্ণনের পরেও এর বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য কীভাবে সংরক্ষিত হয়?

সূর্যালোকের তারতম্যের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরকম আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর ক্রমাগত ঘূর্ণনের ফলে আবহাওয়ার পরিবর্তন, তুষারপাত, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তারতম্য ঘটায় এবং বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্য বিদ্যমান থাকে। আর তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হয়।



সম্ভ্রম ও সম্ভ্রম মেশন

✎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি পরিযায়ী পাখি প্রতি বছর একই পথ ঘুরে কোনো এলাকায় একই জায়গায় এসে ডেরা বাঁধে। আচ্ছা তোমাদের কি মাথায় এসেছে, এই বিশাল রাস্তা চিনে পরিযায়ী পাখি ঠিক জায়গায় কীভাবে পৌঁছায়?

✎ পাখিদের পথ চেনার উপায় বোঝার আগে বরং ভেবে দেখো, আমরা মানুষেরা কীভাবে দিক ঠিক করি? আমাদের দিক চেনার সবচেয়ে বড়ো উপায় হলো সূর্য। এর বাইরেও আমরা দিক নির্ণয় করতে আরেকটা জিনিস ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে কম্পাস। কম্পাস কীভাবে কাজ করে তা তোমরা অনেকেই জানো, কম্পাসের যে দণ্ডটি সব সময় উত্তর দক্ষিণ মুখ করে থাকে সেটি হচ্ছে একটি চুম্বক। বহু বহু বছর আগ থেকে মানুষ দিক নির্ণয়ের জন্য কম্পাস ব্যবহার করে এসেছে। প্রথম কম্পাস ব্যবহারের কথা জানা যায় খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় দুশ বছর আগে, চীন দেশে। পরবর্তী কালে বহু শতাব্দী ধরে সমুদ্রে পাড়ি দেয়া নাবিকেরা জাহাজের দিক ঠিক করার জন্য কম্পাস ব্যবহার করে এসেছে।



✎ পাখি কোন কম্পাস ব্যবহার করে তা জানার আগে চলো জেনে নেয়া যাক, কম্পাসের মূল উপাদান চুম্বক সম্পর্কে।

✎ যে কোনো আকৃতির একটি চুম্বক নাও, এবার বিভিন্ন পদার্থের কাছে নিয়ে দেখো, কোন ধরনের পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে, আর কোন ধরনের পদার্থকে করে না। নিচের ছকে নোট নাও।

চুম্বক আকর্ষণ করে		চুম্বক আকর্ষণ করে না	
বস্তুর নাম	কী দিয়ে তৈরি	বস্তুর নাম	কী দিয়ে তৈরি
<u>পেরেক</u>	<u>লোহা</u>	<u>বই</u>	<u>কাগজ</u>
<u>মুদ্রা</u>	<u>নিকেল</u>	<u>কলম</u>	<u>প্লাস্টিক</u>
<u>চামচ</u>	<u>নিকেল</u>	<u>চেয়ার</u>	<u>কাঠ</u>

✎ চুম্বক প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায়, কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা যায়। তোমরা কি নিজেরা একটি চুম্বক তৈরি করতে পারবে? চেষ্টা করে দেখা যাক!

- এই পরীক্ষার জন্য লাগবে একটা স্থায়ী চুম্বক, আর একটা ইস্পাতের টুকরা বা সুচ জাতীয় জিনিস। ইস্পাতের টুকরা বা সুচের এক মাথায় স্থায়ী চুম্বকের এক মাথা স্পর্শ করে টেনে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাও। তারপর স্থায়ী চুম্বকটি উপরে তুলে আবার আগের জায়গায় স্পর্শ করে টেনে নিতে হবে, অর্থাৎ ঘর্ষণটি সবসময়ই হতে হবে একমুখী। এভাবে কমপক্ষে বিশবার একই দিকে চুম্বকের একই মাথা ব্যবহার করে ঘর্ষণ চালিয়ে যাও। এবার সুচটিকে কোনো লোহা বা নিকেলের পদার্থের কাছে নিয়ে দেখো, আকর্ষণ করছে কী? তোমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে লিখে রাখো।

নমুনা উত্তর:কৃত্রিম চুম্বক তৈরির জন্য স্থায়ী চুম্বক,আর একটা সুচ নিয়েছি। সুচের এক মাথায় চুম্বকের এক মাথা একমুখীভাবে স্পর্শ করে ২০-৩০ বার টেনে শেষ পর্যন্ত নিয়েছি। এরপর সুচটি কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত হওয়ায় সুচটি লোহার পেরেক,ব্রেড,স্টিলের চামচে আকর্ষণ করছে।

- এখন একটা বাটিতে পানি নিয়ে সেই পানিতে সুচটাকে খুব সাবধানে আলতো করে ভাসিয়ে দাও। পানির পৃষ্ঠতান নামক ধর্মের কারণে তাহলে সুচটি ভেসে থাকবে (উপরের শ্রেণিতে পানির এই ধর্ম সম্পর্কে তোমরা বিশদ জানতে পারবে)। খাড়াভাবে ফেলার চেষ্টা করলে সাথে সাথে সুচটি টুপ করে ডুবে যাবে। সুচকে ভাসিয়ে রাখার আরেকটা বুদ্ধি হলো, একটুকরো ছোট কাগজে সুচটিকে গাঁথে তারপর ভাসিয়ে দেয়া।



- এবার ভালভাবে লক্ষ কর, সুচটি কি উত্তর-দক্ষিণ দিক মুখ করে আছে? নিশ্চিত হতে চাইলে বাটিটাকে একটু ঘুরিয়ে দিয়ে দেখো, সুচের দিক একই থাকছে কি না।

৩ তোমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে লিখে রাখো।

.....
..... চুম্বকের সঙ্গে ঘষে নেওয়ার কারণে সুইচিও অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয়েছে। এরপর
..... পাত্রে পানিতে কাগজ বা পাতার উপর সুচটিকে ভাসিয়ে দেওয়ায় সুচটির মাথা
..... উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে। সুচটি সত্যিই উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করে
..... আছে তার সত্যতা জানার জন্য হাত দিয়ে একটু নাড়িয়ে দিয়েছি কিন্তু তবুও সুইচি
..... উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করে ছিল। আমাদের পৃথিবীও একটি বিশাল চুম্বক! আর এই
..... বিশাল চুম্বকের দুটি মাথাও উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করে আছে। পৃথিবীর সব
..... চুম্বকই সেই বিশাল চুম্বকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উত্তর আর দক্ষিণ দিকে মুখ করে
..... থাকে। আর এ কারণেই আমাদের কম্পাসে থাকা সুচটি উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে ছিল।
.....

✎ উপরের পরীক্ষণটি ঠিকঠাক করে থাকলে এতক্ষণে তোমরা কাজ চালানোর মতো একটা কম্পাস তৈরি করে ফেলেছ।

✎ চুম্বক কেন কিছু কিছু পদার্থকে আকর্ষণ করে, আর কেনই-বা উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে? এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য অনুসন্ধানী বই থেকে চুম্বক অধ্যায়ের শুরু থেকে স্থায়ী চুম্বকের অংশটুকু ভালো করে পড়ে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করে নাও।

৩ এখন একটু ভেবে দেখো, চুম্বকের সঙ্গে যেহেতু চার্জের একটা সম্পর্ক আছে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের সাহায্যে কি চুম্বক তৈরি করা সম্ভব? চলো চেষ্টা করে দেখা যাক।

৩ একটি ড্রিংকিং স্ট্রের টুকরার উপরে প্লাস্টিক আবৃত বৈদ্যুতিক তার বেশ কয়েকবার পেঁচিয়ে নাও। শুধু এক পাক তারে চৌম্বক ক্ষেত্র বেশি হয় না বলে বেশ কয়েকবার পেঁচিয়ে নিতে হয়। এবারে একটা কম্পাসের কাছে প্যাঁচানো তারটি রাখ, স্বাভাবিকভাবে কম্পাসের কাঁটাটি শুরুতে উত্তর দিকে মুখ করে থাকবে। এবারে কুণ্ডলীর তারের দু মাথায় একটি ব্যাটারির দু মাথা স্পর্শ করে রাখো। কী দেখছ? কম্পাসটি কি কুণ্ডলীর দিকে ঘুরে যাচ্ছে? এবার আবার ব্যাটারিটি ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের দিকে পাল্টে দিয়ে দেখো, কম্পাসের দিকের কোনো পরিবর্তন দেখছ? পরীক্ষায় তোমাদের পর্যবেক্ষণ নিচে লিখে রাখো :

৩ কী কী ব্যবহার করেছ?

..... ১.ড্রিংকিং স্ট্র
..... ২.বৈদ্যুতিক তার
..... ৩.ব্যাটারি
..... ৪.কম্পাস

➤ কম্পাস কাছে নেয়ার পর কী ঘটল?

কম্পাস কাছে নেয়ার পর যা ঘটল:

প্লাস্টিক-আবৃত তারের কুন্ডলির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করায় সেখানে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়। সেটি কম্পাসকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

➤ ব্যাটারির দিক বদলে দেয়ার পর কী ঘটেছে?

ব্যাটারির দিক বদলে দেয়ার পর যা ঘটেছে:

ব্যাটারির দিক বদলে দেওয়ার পর বিদ্যুৎ প্রবাহের দিক পালটে যাওয়ায় চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকও পালটে যায়।

✍ অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে ‘বিদ্যুতের চুম্বক ক্রিয়া’ ও ‘বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় আবেশ’ অংশটুকু পড়ে নিয়ে ক্লাসের বাকিদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখো। তোমাদের পর্যবেক্ষণের কারণ কি বুঝতে পেরেছ?



নবম ও দশম সেশন

- ✎ চুম্বকের ধর্ম, চুম্বক কীভাবে কাজ করে তা না হয় জানা গেল। এখন প্রশ্ন হলো কম্পাসের ক্ষেত্রে, বা যে কোনো চুম্বকের ক্ষেত্রে এটির দু মেরু সব সময় উত্তর-দক্ষিণ মুখ করে থাকে কেন?
- ✎ এর উত্তরটা তোমরা ইতোমধ্যেই হয়তো জেনেছ। পৃথিবী একটা বিশাল চুম্বক হিসেবে কাজ করে তাই পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর দিকে চুম্বকের উত্তর মেরু, এবং উত্তর মেরুর দিকে চুম্বকের দক্ষিণ মেরু মুখ করে থাকে। আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য অনুসন্ধানী পাঠ বই থেকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে পড়ে নাও। ক্লাসে সবার সঙ্গে আলোচনা করো।
- ✎ এখন প্রশ্ন হলো পরিযায়ী পাখিরা কীভাবে কম্পাস ছাড়াই বিশাল দূরত্বেও ঠিকভাবে দিক নির্ণয় করে থাকে। সূর্য বা তারার গতিপথ কাজে লাগানোর পরেও এই পথ চিনতে যা তাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে তা হলো চুম্বক। অবাক হচ্ছে? যদিও এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে খুব সম্প্রতি গবেষণায় দেখা গেছে পরিযায়ী পাখিদের ঠোঁটের উপর ম্যাগনেটাইট নামক ক্ষুদ্র বস্তুকণা থাকে যার চৌম্বক ধর্ম রয়েছে! এছাড়া তাদের চোখের রেটিনার উপরেও ক্ষুদ্র চৌম্বক কণা তৈরি হয় যা তাদের পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের রেখাগুলো বুঝতে সাহায্য করে। এর ফলে পাখিরা একদম নির্ভুলভাবে পথ চিনে তাদের গন্তব্যে পৌঁছুতে পারে।
- ✎ পরিযায়ী পাখিরা আমাদের প্রকৃতির অংশ। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতার কারণে অনেক সময় তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে। শিক্ষক তোমাদের কয়েকটি পত্রিকার সংবাদ দেবেন, সেখান থেকে তোমরা পরিযায়ী পাখি সম্পর্কে কয়েকটি সংবাদ দেখবে। এর বাইরে তোমরা কি এরকম কোনো ঘটনা শুনেছ? শুনলে নিচে লিখে রাখো,

নমুনা উত্তর:

কিছু অসাধু মানুষ প্রতিবছর এই পরিযায়ী পাখি শিকার করে থাকে। শীতকালে পাখির চাহিদা থাকে প্রচুর। সাদা বকের জোড়া ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা, বালিহাঁস ৪৫০ থেকে ৬০০ টাকা জোড়াসহ আকারভেদে বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়। এ কারণে পাখি শিকারিরা শীতকালে বেশি বেশি পাখি শিকার করে। বিভিন্নভাবে পাখি শিকার করা হয়। পাখির চলার পথে ফাঁদ পেতে, চোখে আলো ফেলে, কেঁচো দিয়ে বড়শি পেতে, কারেন্ট জাল পেতে, বন্দুক দিয়ে, বিষটোপ দিয়ে পাখি শিকার করে শিকারিরা। অনেকে এটাকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়।

- ✎ ইতোমধ্যে তোমরা প্রাকৃতিক বাস্তবত্ব সম্পর্কে জেনেছ। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বাস্তবত্বের প্রতিটি উপাদানের ভূমিকা রয়েছে। পরিযায়ী পাখিরা আমাদের প্রকৃতির অংশ, এরা না থাকলে

আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঠিক থাকবে না। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিযায়ী পাখিদের গুরুত্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনে এদের সুরক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী পরিযায়ী পাখিকে আঘাত করা, দখলে রাখা, ক্রয়-বিক্রয়, পরিবহণ, মাংস ভক্ষণ, শিকার, বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে ধরা ইত্যাদি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যার সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে আসামী ২ বছর কারাদণ্ড অথবা ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন।

✍ তোমাদের এলাকায় পরিযায়ী পাখিদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলতে তোমরা কী করতে পারো? দলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও, তোমাদের পরিকল্পনা নিচে লিখে রাখো,

নমুনা উত্তর:

১. আমাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে আমাদের স্থানীয় ও পরিযায়ী পাখিদের সংরক্ষণের গুরুত্ব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া।
২. প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিযায়ী পাখির ইতিবাচক ভূমিকা সমন্ধে বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদসহ সকলকে সোচ্চার হওয়ায় সহযোগীতা করা।
৩. পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সমুদ্রতট, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর ইত্যাদি জলাভূমি সমূহ জবর দখলের হাত থেকে সুরক্ষা, পরিবেশ ও প্লাষ্টিক বর্জ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

✍ ক্লাসে বাকিদের সঙ্গেও আলাপ করো। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর নিজের অভিজ্ঞতা অন্যদের জানাতে ভুলো না যেন!

ফিরে দেখা

🔗 পরিযায়ী পাখিদের সম্পর্কে নতুন কী কী জানলে এই কাজ করতে গিয়ে?

পরিযায়ী পাখিদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে অনেক তথ্য জানতে পেরেছি যা সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিলনা। পরিযায়ী পাখিরা কিভাবে আমাদের দেশে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসে, কোন সময়টাতে আসে, কেন আসে আবার কিভাবে তারা নিজ গন্তব্যে পৌঁছায় তা সম্পর্কে আমি বিস্তারিত জানতে পেরেছি।

❓ এই কাজ করার পর পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে তোমার নিজের চিন্তায় কি কোনো পরিবর্তন এসেছে?

এই কাজ করার পর পরিযায়ী পাখিদের বিষয়ে আমার চিন্তার পরিবর্তন এসেছে। এইসব পরিযায়ী পাখিরা আমাদের পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষা করে তাই তাদের যেনো ক্ষতি না হয় সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। পরিযায়ী পাখিদের সংরক্ষণের গুরুত্ব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে হবে। পাখি শিকারিদের এইসব বিষয়ে সচেতন করতে হবে। পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সমুদ্রতট, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর ইত্যাদি জলাভূমি সমূহ জবর দখলের হাত থেকে সুরক্ষা, পরিবেশ ও প্লাষ্টিক বর্জ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমি চাই পরিযায়ী পাখিতে সমৃদ্ধ হোক আমাদের এই ছোট্ট ভূখণ্ড।

